বিশ্বপথিক

পিনাকী চক্রবর্তী

এক

প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বিদেশে গেলেন 'চাকুরি উপলক্ষ্যে একবছর পূর্ববঙ্গ আরাকানের মাংডু অঞ্চলে।' তিনি নিজেই লিখেছেন : 'জীবনে চাকুরি উপলক্ষ্যে সেই প্রথম বিদেশে যাওয়া।' সে সময় রেলে, স্টীমারে, পদব্রজে, অন্য জলযানে 'অনেক ধরণের অভিজ্ঞতা হয়' — সে তাঁর জীবনের একেবারে গোড়ার দিকের কথা। সেই তাঁর পরিব্রাজনের শুরু, আস্তিক্যের উপলব্ধির পথে সমাজ থেকে মহাকাশ পর্যন্ত পথপরিক্রমার আরম্ভ। জিজ্ঞেস করা যেতে পারে এখানে, মহাকাশ ভ্রমণ? প্রকৃতই আমরা প্রায়শই মনে রাখি না, একটি আশ্চর্য বিশ্বনির্মিত মহাকাশযানে আমরা সকলেই মহাকাশ ভ্রমণ করে চলেছি, রেডিয়েশন-প্রুফ্ মহাকাশ যাত্রীর পোশাকের বিকল্প, এই স্বচ্ছ, সজীব পর্যাবরণের নীচে, যাকে আমরা 'প্রকৃতি' নামে অভিহিত করি, অথচ বেশিরভাগ মানুষ আমরা সে-সব অনুভব করি না, উপলব্ধি করি না যে এই মহাকাশচারী পৃথিবীর প্রকৃতি, ও তার মহাকাশ নিজেদের সাংকেতিক ভাষায় নিরন্তর কথা বলছে। কেন না সে ভাষা আমরা বেশিরভাগ মানুষ পড়তে পারি না। যাঁরা পারেন, পারতেন তাঁদের মধ্যে আমাদের যুগের একজন সত্যদ্রষ্টা পথিকৃৎ বিভূতিভূষণ। তাঁর যাপনের পথরেখা অনুসরণ করলে দেখতে পাই তিনি একজন সর্বাত্মক অভিযাত্রী পরিব্রাজক। এই লেখায় তাঁকেই আমরা খুঁজে আনব। খুঁজে আনব তাঁর রেখে যাওয়া বিবরণগুলির মধ্যে থেকে। সেই অন্বেষণ শুরু করছি এই পরিব্রাজকের পায়ে চলার পথের গোড়ার দিক থেকে।

এই মানুষটি একটি বিষয়ে কয়েকজন বিরল কথাসাহিত্যিকদের একজন যাঁরা খুব সুসমঞ্জস ও বিশদ দিনলিপি (জার্নাল বা ডায়েরি) লিখে রেখে গেছেন। জার্নাল অনেকেই রাখেন। কিন্তু সেগুলি অনেক সময়ই স্রেফ্ নোট্স্ বা ঘটনার স্মৃতি-সংকেত। চার্লস্ ডারউইন, মার্কো পোলো বা হুয়েনসাং কিংবা মেগাস্থিনিস-এর মতো বা অনেকটা সাম্প্রতিক কালের থোরো (হেনরী ডেভিড) বা থর্ হেয়রডাহ্ল-দের মতো, জার্নালে সমসময়কে প্রতিবিম্বিত রাখার নিদর্শন খুব বেশি নেই। এই ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ এঁদের সমগোত্রীয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, তাঁর ডায়েরি বা তাদৃশ স্মৃতিকথার যে কয়েকটি তাঁর যাপনকালেই প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলির একরকম প্রাক্-প্রকাশ সম্পাদনা তিনি নিজেই করেছিলেন — তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, একটা সময়ে কোনো মানুষ বা ঘটনার কথা বলতে বলতে, সেই সঙ্গে বা ফুট্ নোটে, এই সম্পর্কে পরে আর কিছু ঘটেছিল কিনা তা জানিয়ে যাওয়া। এ কাজটির প্রয়োজন একমাত্র লেখক নিজেই প্রকাশকালে অনুভব করেন। কেন না পরের ডায়েরি প্রকাশিত হবে কি না তার নিশ্চয়তা নেই, এবং হলেও তা পড়ার সময় পাঠকের আগের ডায়েরির সঙ্গে সামঞ্জস্যের কথা মনে থাকবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ফলত এমন একটি ভবিষ্যৎ-ধারী বাক্যবন্ধ তাঁর ডায়েরিতে কখনো কখনো দেখা যায়।

বিভূতিভূষণ যেহেতু বিশ্বাস করতেন যে, কোনো সময়ে এক লেখকের রেখে যাওয়া চিহ্নগুলি পরবর্তী প্রজন্মগুলির জন্য ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তিনি এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁর মতো একজন অনাসক্ত উদাসীন চারণের পক্ষে এতটা পাঠক শ্রদ্ধা সত্যি বড়ো বিস্ময় জাগায়।

তবে ডায়েরিগুলি শুধু তাদের অনুপুঙ্খের কারণেই যে বিশ্বশ্রেণির তা নয়, অন্তর্লিখিত বিশদ বিবরণে প্রত্যক্ষত সমকালব্যাপী পর্যটন চিহ্ন রাখার সঙ্গে সঙ্গে, অপ্রত্যক্ষভাবে এক অনলস সত্য-সুন্দর, অনুসন্ধিৎসু ভূপর্যটককেই আমাদের সামনে প্রকাশ করে। সেগুলিতে তাঁর পথসন্ধির বিরামগুলিতে অন্তর্লীন যে বহির্মুখী অভিকর্ষের টান জেগে থাকে, তাদের দেওয়া রূপরেখায় পড়া যায় এক বিশ্বপথিক বিভূতিভূষণকে যাঁকে বিভিন্ন আত্মকথনের মধ্যে থেকে পুনরাবিষ্কার করাই বর্তমান দিনলিপি পাঠকের উদ্দেশ্য।

বলে রাখা ভালো, এই নিবন্ধের একটি প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপট আছে। আমরা জানি, যদিচ বহুদিন ধরে এই সাহিত্য-পথিকটিকে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' নামে অভিহিত করা হয় (সম্ভবত তাঁর প্রথমদিকের একটি কালোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নাম *অপরাজিত* বলেও) তাঁর মরণোত্তর পরাজয়ের আশঙ্কার একটি বুদ্‌বুদ ইদানীং তৈরি হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। *পথের পাঁচালী*-র রবীন্দ্রনাথকৃত সমালোচনায় (পরিচয় সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল) জানা গিয়েছিল 'উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে আছে তার সত্যের জোরে'। এ কথাটি সেই ঋষিপ্রতিম সত্যদ্রষ্টার মননিঃসৃত বলে বিভূতিভূষণের বেশিরভাগ কথাশিল্পের সম্পর্কেই প্রযোজ্য হয়ে রয়ে গেছে। সেই প্রেক্ষিতে হঠাৎ যদি এ কথা আপাত-প্রমাণিত হয়ে পড়ে যে তিনি হয়তো বা সত্যের ভঙ্গিতে কখনো অসত্য লিখে থাকতে পারেন, তবে তো তাঁর সৃজনের প্রধান ভিত্তিই ভেঙে পড়ে। এবং অচিরে, আমাদের এই ভয়ংকর ছিন্নমস্তা সময়ে সেই অসত্যটিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে। কোনো কোনো বিভ্রান্ত অথচ বিদগ্ধ পাঠকের সম্প্রতি তোলা, কিছু চিহ্নের ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় সে আশঙ্কা জেগে ওঠে বলে, বর্তমান নিবন্ধটির অন্যতম উদ্দেশ্য হল, বিভূতিভূষণের আলাপচারি ডায়েরি ও দিনলিপি সদৃশ স্মৃতিকথার মধ্যে এই সহজ সত্যসাধক বিশ্বপথিক পরিব্রাজকটিকে খুঁজে পাওয়ার কথা জানানো। সত্যেরই অন্বেষণে অন্বিষ্ট বিভূতিভূষণ বারবার বিপদসংকুল দেশ ও মানুষ দেখতে, সুগম্ভীর অনির্বচনীয় রহস্যময়তার গভীর অন্তর্দেশে প্রবেশ করেছেন। ঘরের পাশের নামগোত্রহীন ঘাসফুল, নুড়ি পাথর, গ্রামবাংলার উপেক্ষিতা গৃহবধূ বা মহীরুহ সমাকীর্ণ আরণ্যরাত্রির নীহারিকা সমৃদ্ধ আকাশ ও অরণ্যবাসী মানুষের দিনাতিপাত — পেরিয়ে পেরিয়ে কেবল চলেছেন, যে বিশ্ব নিরন্তর পথের বাঁশি বাজিয়ে চলেছে তারই হৃদয়ের অভ্যন্তরবাসী সত্তাটির আশ্রয়ের গভীর শুশ্রূষার ভিতর।

দুই

তাঁর প্রথম বিদেশে যাওয়ার যে কথা প্রথমেই লিখেছি, সেখানে যাবার পথে শুধু দেখতে চাওয়ার নেশার মতো টান তাঁকে অনেকবার বিপদের মধ্যে টেনেছে। তবু তাঁর, তার মধ্যেই বাইরে বেরিয়ে

পড়ার টান। কিসের বাইরে, কোন্ বাইরে, কত বাইরে বোঝাও যেন রহস্যযাপন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানের বাণী মনে আসে : 'সেইপথ হারানোর অধীর টানে/অকূলে পথ আপনি টানে/দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে' কে টানত তাঁকে তা সেই প্রথমে অধরা থাকলেও, উল্লিখিত গানটির অন্য বাণীও সত্য ছিল বিভূতিভূষণের যাপনে — 'আমার তরী ছিল চেনার কূলে,/বাঁধন যে তার গেল খুলে/তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে —'

এবং খানিকটা পরিণত বয়সের ডায়েরিতে দেখা দিল 'অস্তি'-র খোঁজ পেয়ে যাওয়া। কিন্তু প্রথম থেকেই 'বাহির' তাঁকে টেনেছে অন্তরের গভীর থেকেই —। *অভিযাত্রিক* থেকে নীচের ঘটনাটি পড়া যাক।

কক্সবাজারে একদিন একটি ঘটনা ঘটেছিল।

জীবনের সে এক বিপদ্‌জনক অভিজ্ঞতা — প্রাণসংশয়ও ঘটতে পারতো সে দিন।

কক্সবাজারে সমুদ্রের ধারে সাগরবেলায় জোয়ার নেমে গেলে কড়ি, শঙ্খ, ঝিনুক ইত্যাদি কত পড়ে থাকে; বড় বড় সমুদ্রের ঢেউ এসে কূলে তুলে দেয়। জ্যোৎস্নাপক্ষের রাত্রি, কত রাত পর্যন্ত সেখানে একা চুপ করে বসে থাকি, যশোর জেলার একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম থেকে কতদূর যেন চলে এসেচি, সেখানকার ক্ষুদ্রনদী ইছামতীর দুপাড়ের বাঁশবনের কথা ভুলতে পারিনে, এতদূরে বসে দেশের স্বপ্ন দেখতে কি ভালোই যে লাগে!

কাউখালি বলে ছোট্ট একটি নদী বা খাল কক্সবাজারের পাশ দিয়ে এসে সমুদ্রে পড়েচে। একদিন একখানা সাম্‌পান ভাড়া করে কাউখালি থেকে বার হয়ে সমুদ্রে বেড়াতে গেলুম। মাঝি মাত্র একজন, চাটগাঁয়ের বুলিতে বললে, কতদুর যাবেন বাবু?

— অনেক দূর, চলো সমুদ্রের মধ্যে। সন্ধ্যের পর ফিরবো —

— আদিনাথ যাবেন?

একটা ছোট পাহাড় সমুদ্রগর্ভ থেকে খাড়া উঠেছে — তার মাথায় আদিনাথ শিবের মন্দির। এ অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, অনেকদূর থেকে লোকে আসে আদিনাথ দর্শন করতে, শিবরাত্রির সময় বড় মেলা হয়। কাউখালি নদী যেখানে সমুদ্রে এসে পড়লো, তার ডাইনে প্রায় মাইল দুই দূরে আদিনাথ পাহাড় সমুদ্র থেকে উঠেচে, আর ঠিক সামনে অদূরেই একটা বড় চড়ার মত কি দেখা যাচ্চে। মাঝিকে বললুম — ওটা কি চড়া পড়েচে?

মাঝি বললে — না বাবু, ওটা সোনাদিয়া দ্বীপ। ভাঁটার পরে ওখানে অনেক কড়ি, শাঁখ, ঝিনুক পড়ে থাকে।

শুনে আমার লোভ হল। মাঝিকে সোনাদিয়া দ্বীপে যেতে বললুম।

মাঝি একবার কি একটা আপত্তি করলে, আমি ভালো বুঝলুম না ওর কথা।

সাম্‌পান সাগর বেয়ে চলেচে, বিকেল পাঁচটা, সমুদ্রের বুকে সূর্য ডুবুডুবু, হু-হু খোলা হাওয়া কাউখালির মোহানা দিয়ে ভেসে আসচে, আদিনাথ পাহাড়ের মাথায় অস্তসূর্যের রাঙা রোদ। মনে হয় যেন কতকাল ধরে সমুদ্রের বুকে ভাসচি, দূরে সাউথ সি দ্বীপপুঞ্জের অর্ধচন্দ্রাকৃতি সাগরবেলা, যা ছবিতে ছাড়া কখনো দেখিনি — তাও যেন অনেক নিকটে এসে পৌঁছেচে —

তাদের শ্যাম নারিকেলপুঞ্জের শাখাপ্রশাখার সঙ্গীত যেন শুনতে পাই।

সোনাদিয়া দ্বীপে যখন সাম্‌পান ভিড়লো তখন জ্যোৎস্না উঠেচে।

ছোট্ট চড়ার মতো ব্যাপারটা, গঙ্গার বুকে হুগলি শহরের সামনে অমন ধরনের চড়া কত দেখেচি ছেলেবেলায়। একটা গাছপালা নেই, বাড়িঘর তো নেই-ই, শুধু একটা বালির চড়া— জল থেকে তার উচ্চতা কোথাও হাত খানেকের বেশি নয়।

কিন্তু সে কি সুন্দর জায়গা! অতটুকু বালির চড়া বেষ্টন করে চারিধারে অকূল জলরাশি, জ্যোৎস্নালোকে দূরের তটরেখা মিলিয়ে গিয়েচে। আদিনাথ পাহাড়ও আর দেখা যায় না, সুতরাং আমার অনুভূতির কাছে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বুকে যে-কোনো জনহীন দ্বীপই বা কি, আর কক্সবাজারের সমুদ্র-উপকূল থেকে মাত্র দু মাইল দূরের সোনাদিয়া দ্বীপই বা কি, আমাদের গ্রামের মাঠে বসে বৈকালের আকাশের দিকে চেয়ে মেঘস্তূপের মায়ায় রচিত তুষারমৌলী হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ কি ত্রিশূল কতদিন প্রত্যক্ষ করিনি কি!

এই পর্যন্ত লিখে, বিভূতিভূষণের সঙ্গে তাঁর আসন্ন বিপদের মধ্যে প্রবেশ করবার আগে একটি বৈশিষ্ট্য বলি — নতুন কিছুর খোঁজে যশোর-বনগাঁয়ের গ্রাম থেকে চট্টগ্রাম সেখান থেকেও চলবার টানে, সমুদ্র-অভিযানের টানে 'অকূলে পথ আপনি' যে টানছে তা সামান্য সাধারণ সংসারীর থাকে না, থাকে বিশ্বান্বেষী পথিকেরই। সেই টানই যশোরের আকাশের ও মেঘে হিমালয়শৃঙ্গে প্রদর্শনে টেনে আনে আবার সমুদ্রের ছোট্টদ্বীপে বিশ্বের গভীরতম সমুদ্রযাত্রার আস্বাদ মনে এনে দেয়। এবং তা থেকে উপচে পড়ে ভালো লাগছে উপলব্ধি — এ শুধু অনন্ত প্রব্রজ্যায় চলা চিরপথিকের বুকের সম্পদ।

কিন্তু তারপর কি ঘটেছিল? তাঁর নিজের কথায় পড়ে নেওয়া যাক —

... বোধ হয় ঘণ্টাখানেক কেটে থাকবে — এমন সময় সাম্‌পানের মাঝি বললে — বাবু, শিগ্‌গীর নৌকোয় উঠে বসুন — জোয়ার আসচে।

ওর গলায় ভয়ের সুর। বিস্মিত হয়ে বললুম — কেন, কি হয়েচে?

মাঝি বললে — সোনাদিয়া দ্বীপ জোয়ারের সময় ডুবে যায় — সাঁতার জানলেও অনেকে ডুবে মরেচে। একটু তাড়াতাড়ি করুন কর্তা।

বলে কি! শেষকালে বেঘোরে ডুবে মরতে রাজি নই! একটু বেশি তাড়াতাড়ি করেই সাম্‌পানে উঠলুম। ...

কিন্তু যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্চি, সেটা ঘটলো এর ঠিক পরেই — জোয়ারে ডুবে মরার সম্ভাবনার চেয়ে সেটা কম বিপদ্‌জনক নয়।

খানিকদুর এসে সমুদ্রের মধ্যে কুয়াশা নামলো। ...

এরপরে সেই ভয়ংকর বিপদের বিবরণ, *অভিযাত্রিক* নামের স্মৃতিকথা থেকে নিজেরা পড়লেই বেশি আনন্দের। পাঠককে সেই হদিশটি দিয়ে আপাতত নিজের কথায় ফিরি।

চেঙ্গিস খানকে মঙ্গলদেশে তাকলামাকান মরুভূমির দুস্তরতার রহস্যই টেনেছিল। তিনি সেই টানে বেরিয়ে দেশ ও মানুষ দেখার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সে জার্নাল এখন ইতিহাস হয়ে আছে। তার ছত্রগুলি চেঙ্গিসের সময়ে তাঁর যাত্রাপথের সমাজ, সংস্কার মানুষ বিষয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডারের কাজ করা ছাড়াও তাঁর ও সময়ের অন্তর্লোকেরও ঠিকানা জানায়। মেগাস্থিনিস, হুয়েন সাং থেকে মার্কো পোলো ভাস্কো ডা গামা বা এই সেদিনের থর্ হেয়রডাহ্ল বা হেনরি ডেভিড থোরোর জার্নালের বিররণগুলিতেও এ ধরনের কাজ করে। যে প্রশ্ন তাড়ায়, পোড়ায় তা হল, কেন ওরা বেরিয়ে পড়েছিলেন! কিসের টানে আমেরিগো ভেসপুচি ইউরোপ থেকে খুঁজতে গিয়েছিলেন নতুন দেশ! হেয়রডাহ্ল-এর জার্নালগুলি থেকে একটি তথ্য বেরিয়ে এসেছে। বিশেষত তাঁর 'রা' বা 'কনটিকি' থেকে — এসব আবিষ্কারের বহুকাল পূর্বে, প্রাচীন আফ্রিকাবাসীদের সমুদ্রযাত্রার ফলে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং তারও আনুমানিক একহাজার বছর পরে ইস্টার আইল্যান্ড বা তাহিতি আবিষ্কৃত হয়েছিল — জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত অভিযানের ফলে। কেন বেরিয়ে পড়ত তারা! কীভাবে অনুভব গড়ে উঠেছিল সূর্য যেদিক থেকে আসে সেই দিকে সূর্যদেবের বাসভূমি (রা এবং কনটিকি — দুইয়েরই মানে সূর্যদেবতা) সেইদিকে নতুন দেশে যেতে হবে?

এমন অভিযানের কিছু অগভীর আর্থসামাজিক ব্যাখ্যা বলে যে, বর্তমানের রসদে টান পড়ে বলেই মানুষ, কেউ না কেউ, একা কিংবা মিলিতভাবে দেশ খুঁজতে বেরোয়। কিন্তু আকাশের সংকেতে সাড়া দিয়ে কেন! প্রকৃতপক্ষে বাসস্থানের নির্দিষ্ট সীমায় বন্দি হয়ে যায় আত্মান্বেষের সমস্ত মাত্রাগুলি। ফলে, শুধুই ক্ষুন্নিবৃত্তির সংকট নয়, আরও কোনো 'বিপন্ন বিস্ময়' কিছু ব্যতিক্রমী মানুষকে ঠেলে বের করে সীমানা ডিঙিয়ে খুঁজে দেখতে, কী আছে? আছে কি? কোথা থেকে কেন আসা, কোথায় যাবার জন্যে — এই ভাবনা অস্থির করে তোলে। অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত, ক্রমশ দূরগামী দিগন্ত টেনে নিয়ে যায় এঁদের। বিভূতিভূষণ এঁদেরই একজন উত্তরসূরি।

হে অরণ্য কথা কও নামের দিনলিপি-জাতীয় স্মৃতিকথায় একজায়গায় তিনি লিখেছিলেন :

> কলকাতায় মেসে থেকে যখন চাকুরি করি স্কুলে, তখন সুদীর্ঘ তেরো বছরের মধ্যে এইসব দিনে বারাকপুরের বর্ষাসিক্ত বনঝোপের বিরহ আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতো। বাল্যে কত খেলা করেছি আমি, কালী, ভরত, কচা এই বনতলে ঝোপের ছায়ায়। কত কী পাখীর গান শুনেছি। কত পাকা মাকালফল তুলে এনেছি উত্তর মাঠের বন থেকে, — শাঁখারিপুকুরের ধারের গাছপালার ওপরে-ওঠা মাকাললতা থেকে — মনে হোত সেই রহস্যময় বিচিত্র বাল্য মনোভাব, সেই ঝোপের তলায় বেড়ানো, তখন বোধহয় বনপরীরা সঙ্গে নিয়ে খেলে বেড়াতো — বুঝতাম না সংসারের কিছু, বুঝতাম শুধু তেলাকুচোর ফুল, বনকলমীর ফুলের বাহার হয়েছে কোন্ ঝোপে, কোথায় টুকটুকে মাকাল ফল ঝুলচে কোন্ গাছে — এই সব। বনপরীদের সঙ্গী ছিলাম তখন। মনে এতটুকু ধুলো মাটি লাগে নি সংসারের। কি অপূর্ব আনন্দে মন মেতে উঠতো যখন দেখতাম গাছে থোলো থোলো পটপটির ফল ফলে আছে। এ সব ফল খাওয়া যায় না, পাখীরও অখাদ্য কোনো কোনো ফল। সুতরাং রসনা তৃপ্তির লোভ নয় — এ

সব ফলে খেলা হয় এইটেই ছিল তখন বড় কথা। দেখতে ভালো লাগে এইটেই ছিল বড় আনন্দের উৎস। খেলা আর আনন্দ। লীলাই সবচেয়ে বড় কথা। শেকস্‌পীয়র বুঝেছিলেন। তাই বলচেন, "The Play is the thing." Play! লীলা, খেলা। সংসার শাশ্বত মানবাত্মার লীলাভূমি। এখানে তারা আসেনি ঘরবাড়ী বানাতে, আসেনি ব্যাঙ্কে অর্থ জমাতে, আসেনি রায়বাহাদুর হতে। 'স্যার' হয়ে মোটর চড়ে বড় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর হতে। ওসব তাদের মনের ভুল, মায়া অথবা মোহ। ...

এই দিনলিপি লেখার সময়ে জীবনানন্দের 'আটবছর আগে একদিন' কবিতা লেখাই হয়নি! এবং যে লীলার খোঁজ ও আনন্দ বনঝোপে, মাঠে মাঠে তাঁকে আবাল্য টেনেছে সেই একই তৃষ্ণা তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে পদব্রজে বহু দীর্ঘ পথ বিপদসংকুল আরাকান-ইয়োমার গভীর অরণ্যে বা সিংভূম, সারান্ডার আরণ্য-পল্লিবাসীদের কাছে।

চার

ঘাটশিলার কাছে 'ধারাগিরি' প্রস্রবণের কথা এবার। ঘাটশিলায় ফুলডুংরি নামে একটা ছোটো পাহাড় আছে। এরকম ছোটোখাটো টিলার মতো বা খানিকটা উঁচু পাহাড় সঙ্গে জঙ্গল আশেপাশে অনেক আছে। ফুলডুংরি থেকে বনের দিকে পনেরো-ষোলো কিলোমিটার বাসে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আরও তিন-চার কিলোমিটারের মতো পায়ে হেঁটে ঢুকলে একটা আশ্চর্য সুন্দর পরিমণ্ডল খুঁজে পাওয়া যায়। জায়গাটা প্রায় তিনদিকেই উঁচু কালো পাথরের দেয়াল অথবা জঙ্গল। দাঁড়াবার জায়গাটাও খুব বড়ো বড়ো পাথরের ওপরে, সময়ের প্রবাহ সমতল করে খানিকটা চাতালের মতো সৃষ্টি করেছে। প্রায় মাঝখানে একটা ছোট্ট জলাশয় — যেখানে জলের ধারাটা আসছে উঁচু পাথরের দেয়ালের ওপর থেকে ঝির্ ঝির্ করে। এই প্রবাহ-ই বর্ষা হলে প্রবল জলপ্রপাতের আকার নেয়। এখানে অনেক পাখির ডাক, পাথর আর সবুজের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো, এবং মাঝখানে মাথার ওপরে গোলাকার আকাশ। এই জায়গার নাম ধারাগিরি।

বিভূতিভূষণের অনেক সন্ধ্যা, কখনো নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি এই চাতালে একলা নীরবে বসে শান্ত নিমগ্ন কেটে গেছে। এই তথ্যটি প্রথমে তাঁর ভাগ্নী-জামাই সাহিত্যিক শ্রী শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছিলাম। পরে কোনো দিনলিপিতেও পেয়েছি। প্রথম জেনে খুব একটা ভাবান্তর হয়নি। পরে একটা শিহরণের মধ্যে আমি আমার এই বিভূতিভূষণকে আবিষ্কার করি। মনে একটা প্রশ্ন এল, তিনি অত রাতে এখানে আসতেন কীভাবে! আমি যে সময়ে গেছি তখন দিনে দু-তিনটি বাস সেদিকে যায়, তা-ও সমস্ত পথ নয়। বাস ছেড়ে পায়ে হেঁটে মাইল-দুই ঢুকে পড়তে হয় গভীর অরণ্যে। ষাট-সত্তর বছর আগে এই সমস্ত পথ গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়েই ছিল, যানবাহন রহিত। বিভূতিভূষণের আবাসস্থল থেকে ধারাগিরি প্রায় পনেরো-ষোলো মাইল। এই দূরত্ব তিনি পায়ে হেঁটে যেতেন ও ফিরতেন একটিই দিন-রাতের মধ্যে!

দিনলিপিগুলিতে খুঁজলে পাওয়া যাবে, তিনি পায়ে হেঁটে অরণ্যপথে চলেছেন ধারাগিরির দিকে (*বনে-পাহাড়ে*)। অরণ্যের দিক থেকে আসছে বনবাসী মানুষ, যারা তাঁকে দেখে দেখে চিনে

গেছে। তখন সন্ধে নেমে আসছে। এমন পথ অন্ধকারে দশমাইল পেরিয়ে গিয়ে জনহীন বসতিহীন অরণ্যের সূক্ষ্ম প্রাচুর্যময় গাম্ভীর্যের মধ্যে স্থির বসে থাকা, কল্পনায় রোমাঞ্চকর লাগে বটে কিন্তু তা সম্পন্ন করতে গেলে যথার্থই মনেপ্রাণে একজন অভিযাত্রী না হলে হয় না। 'প্রকৃতি-প্রেমিক' এই শব্দসীমায় বিভূতিভূষণকে ধরে না।

লেখকের যেদিকটি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় তা হল অভিযাত্রী সত্তা। *আরণ্যক* পড়া শেষ হলে ও আমাদের মনে পড়ে না যে এই সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে অন্যতম প্রথম সারির যিনি এই শতাব্দীর ঘনায়মান প্রবল বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আজ, 'পরিবেশ ধ্বংস হয়ে গেল, গেল গেল অরণ্য শেষ হয়ে' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এই উন্নয়ন sustainable নয় — এই আশঙ্কায় সারা পৃথিবীকে আমরা মনোযোগ দিতে বলছি, জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষার দিকে সামাজিক দৃষ্টি আকর্ষণ করছি — এ সব সতর্কীকরণ বিভূতিভূষণের দিনলিপির অনেক জায়গায় দেখা দিয়েছে। যেটি গভীরতর সত্য তা হল নিজের যাপনের মধ্যে দিয়েই বিভূতিভূষণ এ বাণী উচ্চারণের অধিকার অর্জন করেছিলেন।

বস্তুত কথা কাজ ও বিশ্বাস যদি একজায়গায় না থাকে তবে মহৎ লেখক হওয়া সম্ভব নয়। এই সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যিক এক বহুমাত্রিক বিশ্বপথের পথিক — কোনোমাত্রায় দুর্গম অরণ্যে, অন্য কোনো মাত্রায় ঈশ্বরের সান্নিধ্যে, অপরমাত্রায় অপার্থিব অন্য কোনো লোকে পরিব্রাজন করেছেন এই পথের প্রেমিক।

পথের পাঁচালী-র সতেরো অধ্যায়ে অপুর জবানিতে লেখা হয়েছে :

> সে ওই সব জায়গায় যাইবে, ওই সব দেখিবে, বিলাত যাইবে, জাপান যাইবে, বাণিজ্য যাত্রা করিবে, বড় সওদাগর হইবে, অনবরত দেশ বিদেশে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিবে, বড় বড় বিপদের মুখে পড়িবে; চীন সমুদ্রের মধ্যে আজিকার এই মন মাতানো কালবৈশাখীর ঝড়ের মত বিষম ঝড়ে তাহার জাহাজ ডুবুডুবু হইলে 'আমার অপূর্ব ভ্রমণ'-এ পঠিত নাবিকদের মত সেও জালিবোটে করিয়া ডুবোপাহাড়ের গায়ে লাগা গুগ্‌লি শামুক কুড়াইয়া খাইতে খাইতে অকূল দরিয়ায় পাড়ি দিবে! ওই যে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবনের মাথায় তুঁতে রঙের মেঘের পাহাড় খানিকটা আগেই ঝুঁকিয়াছিল ওরই ওপারে সেইসব নীল সমুদ্র, অজানা বেলাভূমি, নারিকেল কুঞ্জ, আগ্নেয়গিরি, তুষারবর্ষি প্রান্তর ... সে সব দেশে কাহারা যেন তাহার অপেক্ষা করিয়া আছে।

এ অংশ বিভূতিভূষণের দিনলিপিগুলির অনেক বিক্ষিপ্ত অংশের প্রতিধ্বনি। ব্যক্তি রোমাঞ্চপ্রিয় বিভূতিভূষণ, এর মধ্যে অনন্ত পথের যাত্রী বিভূতিভূষণের সঙ্গে কোথায় গিয়ে মিলেমিশে বহুমাত্রায় বিশ্ব পরিব্রাজনে বেরিয়ে পড়েছে।

পাঁচ

সম্প্রতি বিভূতিভূষণের দিনলিপি বা স্মৃতিকথায় লেখা ভ্রমণ বর্ণনার বিষয়ে কিছু বিদগ্ধ মহলের কপালে ভাঁজ পড়তে দেখা গেছে। কিন্তু যেসব যুক্তির ভিত্তিতে সন্দেহের দাবি সেগুলি নিতান্তই

অসার। অবশ্য সন্দেহ যেহেতু বিজ্ঞানের প্রথম সোপান, বৈজ্ঞানিককে সে-কারণে ছোটো করা অনুচিত। তাঁরা ছোট বা সংকীর্ণ মোটেই নন, বিভ্রান্ত। তবে সন্দেহ যেহেতু প্রকাশিত, তার নিরসন ঘটানোও একটি বিজ্ঞানজনিত কর্তব্য। অতএব সংক্ষেপে সন্দেহ ও নিরসন মিলিয়ে এই অংশটি লিখছি।

সন্দেহের আবির্ভাব, কোনো যথার্থ বিশারদ অন্বেষীর বিভূতিভূষণ উল্লিখিত দু-তিনটি স্থানকে প্রত্যাশিত স্থানাঙ্কে বা আদৌ, খুঁজে না পাওয়া, এবং সেই সঙ্গে সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মানচিত্রে ও-সব জায়গার নাম না থাকা। ও তার সঙ্গে কোনো অগভীর তাথ্যিকের মন্তব্য : 'বন্যায় ভেসে না গেলে স্থানের নাম হারিয়ে যায় না', — এ ধরনের সন্দেহের অগ্নিতে কিঞ্চিৎ ইন্ধক দিয়ে দেয়।

কিন্তু কেউ কি অস্বীকার করবেন, Data, দুর্গম অঞ্চলের সম্বন্ধে প্রায়ই Manufactured হত। সে ক্ষেত্রে এতকাল আগে ডাটাতে জল মেশানোর সম্ভাবনা তো বাতিল করা যায় না, বিশেষত স্থানগুলি ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, স্মলপক্স অধ্যুষিত হলে, এবং বিদেশি তথ্য-সংগ্রাহক হলে, সে সম্ভাবনা বেশ জোরদার হয়ে ওঠে। নানা কৌশলগত, রাজনৈতিক, ও ক্ষমতার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনে স্থানের নামকে উপেক্ষা করে যাওয়ার ঘটনা প্রচুর ঘটেছে। এছাড়া মারী, মড়ক মন্বন্তরে বিধ্বস্ত প্রত্যন্ত দেশের কোথাও গ্রাম ছেড়ে সব চলে গেলে স্থানের নাম তাদের সঙ্গে যায় বা উধাও হতে পারে। এবং স্থানাঙ্ক বিচারে ভুল বেরোলে বলা যায় বিভূতিভূষণ সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কাজে হাতে সেক্সট্যাঙ্ক বা অনুরূপ কোনো যন্ত্র নিয়ে ভ্রমণ করেননি, যে তাঁকে সেই নিরিখে নিখুঁত হতেই হবে!

অতএব সন্দেহীর লেখা থেকেই যদি জানা যায় যে অধিকাংশ স্থানই খুঁজে পাওয়া গেছে, তবে খুঁজে পাওয়া না-যাওয়া দু-তিনটি স্থানের দায়িত্ব লেখক-পরিব্রাজকটির কাঁধ থেকে নামিয়ে নেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। বিভূতিভূষণ নিশ্চয়ই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন বিদেশ-বিভূঁইয়ে স্থান-নাম শুনে শুনেই জেনেছেন ও নোট রেখেছেন। কোথাও ছোটোখাটো বিভ্রম হয়ে থাকলেই, তাঁর পর্যটন কথা অলীক হয়ে পড়ে না। দারকেশা পৌঁছোনোর বিঘ্নবৃষ্টিপূর্ণ অরণ্যপথের বিবরণ ডায়েরির কোনো জায়গায়, অন্যত্র না-যাওয়াই সাব্যস্ত করার কথা ভিন্ন ভিন্ন ডায়েরিতে পাওয়া গেলে বুঝতে হবে এ দুটো ভিন্ন সময়ের ঘটনা, দুটোই সত্যি। *চাঁদের পাহাড়*-এ আফ্রিকার বিষয়ে কোনো ভৌগোলিক ভ্রান্তি থাকলে তা বিভূতিভূষণের তথ্যের উৎসগ্রন্থগুলির কারণ। তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে আফ্রিকায় তিনি যান নি, কয়েকটি বই পড়েই সে-সব কথা জেনেছেন।

এছাড়া যে বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চলে বিভূতিভূষণ ঘুরেছিলেন, ছোটোনাগপুর থেকে পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, যে সব জায়গা তো পরে বার দুয়েক ভয়ংকর ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, নথিপত্র রাখার অনেক জায়গা বন্যাতেও বিপর্যস্ত হয়েছিল।

এই সঙ্গে উল্লেখ করা উচিত, বিভূতিভূষণ খুব কাছ থেকে যে ভূগোলে জঙ্গলের মানুষদের সঙ্গে মিশেছেন (দেখেছেন, মিশেছেন বিস্তর। কোনো দিনলিপিতে আছে মানুষ না দেখলে আর দেশ দেখা কি — উৎস মনে নেই)। দেখেছেন নিবিড়ভাবে তাদের দারিদ্র্যপীড়িত, অরণ্য-শ্রদ্ধাকে; তা যদি নাতিদূরস্থ জঙ্গলের মানুষদের ক্ষেত্রে আরোপ করেই থাকেন, তা কি কথাসাহিত্যের মাপে

বেআইনি হয়ে যায়? অরণ্যের আদত মানুষদের দুঃখ-যন্ত্রণাগুলো যে সারা পৃথিবী জুড়েই একরকমের।

নিজের সুবিস্তৃত ভ্রামণিক অভিজ্ঞতায় মিশেছিল তাঁর বিপুল পড়াশোনা, *Wide World* নামের একটি জার্নালের তিনি নিয়মিত পাঠক ও ছিলেন, এছাড়া Lands and People-এর মধ্যে বিচরণের নিদর্শনও তাঁর দিনলিপিতেই আছে। আছে অনেক বিশ্বদ্রষ্টা দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের লেখার সঙ্গে নিকট সম্পর্কের প্রমাণ। কাজেই শুধু স্থানিক মাপকাঠিতেই নয় বুদ্ধি ও দর্শন গভীরতার মাপকাঠিতে মানুষটিকে বিশ্বচারণ কবি বললেই মনে হয় ঠিক বলা হয়।

উপসংহার

দিনলিপি ও স্মৃতিকথার পথরেখায় বিভূতিভূষণকে চিনতে চাওয়া নিজেই একটি বিস্তৃত অভিযানের সমকক্ষ। তাঁর ধারাভাষ্যে পাওয়া বহির্বিশ্বের একটি মাত্রাকে, সাধারণ বা বিজ্ঞান-মৌলবাদী কারো পক্ষে মেনে নেওয়ার অসুবিধা খুব স্বাভাবিক। বিভূতিভূষণ *দেবযান*-এ বিশ্বপথের যে মাত্রার উল্লেখ করেছেন তা তো বাস্তবে পরিক্রমণ সম্ভব নয়। তবে দিনলিপিগুলির অনেক ক্ষেত্রে অনেক আশ্চর্য স্বপ্ন-বিবরণ আছে যেগুলি তাদৃশ ভ্রমণের নামান্তর বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। Dr. Brian L. Weiss বলে একজন বিশ্ববিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী তাঁর লেখাগুলিতে, বিশেষ করে *Many Lives, Many Masters* বইটিতে বিজ্ঞান-নির্ভর পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণের সাহায্যে অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরীয় মাত্রা, অন্য লোকের অস্তিত্ব — যা স্বপ্নে বা সম্মোহনে ধরা দেয় — প্রমাণ করেছেন। অতএব সে বিশ্বকে সপাটে নস্যাৎ করাও মূঢ়তা বা অবৈজ্ঞানিক গোঁড়ামির নামান্তর বলা যায়।

স্মৃতির রেখা দিনলিপি শুরু হয়েছে : 'কাল তোমাকে দেখতে পেয়েছি। শেষরাত্রের কাটা চাঁদের ও শুকতারার পেছনে তুমি ছিলে।...' এরই কয়েক লাইন পরে বলছেন : '...দু হাজার বছর আগে এরা সব কোথায় ছিল? দু হাজার বছর পরেই বা কোথায় থাকবে? এদের সমস্ত ছোটখাটো সুখদুঃখ আনন্দ-হতাশা নিয়ে ছোট্ট বুদ্বুদের মত অনন্ত গহন গভীর কাল সমুদ্রে কোথায় মিলিয়ে যাবে। তার ঠিকানাও মিলবে না ...' মহাকাশময় বিশ্বজগতের দূর শত আলোকবর্ষ দূরত্বে সম্ভাব্য প্রাণকণিকার অস্তিত্বকে শ্রদ্ধা করা, কোটি কোটি নীহারিকা সংবলিত মহাকাশের মহাকালের এই বিন্দুতে বসে এক অবাঙ্‌মানসগোচরের বহুপথ সংকেতকে গ্রহণ করার মায়াবী রোমাঞ্চকর বিবরণ বিভূতিভূষণের যাপন, — যার খবর তাঁর ডায়েরিগুলির সমস্ত বিচারে শ্রদ্ধাবনত হয়ে রয়েছে।

পথের পাঁচালী-র শেষের কটি দিকে কয়েকটি লাইন তাঁর মহাবিশ্বের মহাকালব্যাপী পথকে চিনিয়ে দেয় :

> পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন — মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়? তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে ... দেশ ছেড়ে, বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে

অপরিচয়ের উদ্দেশে ...

দিনরাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চ'লে যায় ... তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনো ফুরোয় না ... চলে ... চলে ... চলে ... এগিয়েই চলে ...

অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ ...

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া ক'রে এনেছি! ...

চল এগিয়ে যাই।

এখন তো সকলেই জেনেছি সেই 'মূর্খ বালক' ... বিভূতিভূষণ নিজেই। তারই অন্তরের গান ওই বাজে 'মহাবিশ্বে, মহাকাশে আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে' ...